ধার্মিকতা ও কপটচারিতা– এদেশে যে কথাগুলো বলাও বিপজ্জনক

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: 'প্রকৃত ধার্মিক বলতে কী বোঝায়')

পবিত্র রমজান মাস চলছে। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে এ মাসে ধার্মিকতার আধিক্য আমরা প্রতিবছর দেখি। অনেকে সাধ্যমত দান-খয়রাত করেন। সামর্থবান অনেকেই এ মাসে ওমরাহ পালন করেন। অনেক সাওয়াব হাসিল করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। একজন মুসলমান তার সৃষ্টিকর্তার কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেছে, এটা ভেবে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। দেশে বসেও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের ভালো কাজ (সৎকর্ম) দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। ইবাদত বলতে তো শুধু রোজা রাখা, ওমরাহ পালন, তারাবির নামাজ পড়া বোঝায় না, দুনিয়াদারির সব কাজ ও পেশা ভালোভাবে নির্দেশিত পথে চালিয়ে জীবনকর্ম নির্বাহকেও বুঝায়। ব্যবহারিক অর্থে ধার্মিকতা হচ্ছে আল্লাহভীতি, সত্যের প্রতি সচেতনতা ইত্যাদি। অন্যভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে বেঁচে থাকা ও তাঁর হুকুম মেনে চলাই হলো তাকওয়া (আল্লাহ-সচেতনতা)। আবার সব ধরনের অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই তাকওয়া। সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের কাছে রোজার মাসে 'শয়তান নাকি বাঁধা থাকে' বলতেও শুনেছি । কখনো মনে কোনো কোনো ঘটনায় খটকা লাগে, বাঁধা থাকা অবস্থায়ই যদি কপটচারীদের এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্য এগারো মাসের অবস্থা কী?

এ মাসেও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিশ্ববাসীর সামনে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রনায়কও গদি রক্ষার তাগিদে মুখে কার্যত কুলুপ এঁটে বসে থাকছেন। কোনো কোনো নেতা মেপে মেপে কথা বলছেন, কপটচারিতা করছেন, তারাও তো নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেন। আমাদের দেশের মৌলবি-মাওলানাদের কাছ থেকে এদেশের মুসলমানদের ধার্মিকতার বিষয়ে অনেক মূল্যবান পথনির্দেশক বক্তব্য ও চিন্তা-ভাবনা আশা করি। কিন্তু বিধি বাম। তাদের ওয়াজ-নসিহতের বিষয়বস্তু পালটে গেছে। ধার্মিকতা বলতে আমি নিরাশ হয়ে নিজেই দু-চার কথা না লিখে গত্যন্তর থাকছে না। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এদেশের মৌলবি-মাওলানাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে অন্তর্বিরোধ ও বিভক্তি, অনেকের ধর্ম বিক্রি করার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক দলের চাটুকারিতা আমাকে ভীষণভাবে আহত করে।

এতে মুসলমানরা মুসলমানিত্ব থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার যত অকল্যাণকর চিন্তা-ভাবনা, প্রতারণাপূর্ণ মন-মানসিকতা; দেশ-বিদেশের মানুষ, সমাজ ও দেশবিরুদ্ধ কাজ করার পথে একটা অন্তর্নিহিত বাধা। প্রকৃত মুসলমানদের জন্য সুস্থ চিন্তাধারাসহ দেশের আইন মেনে চলা আপনাআপনি পালিত হয়ে যায়। আমাদের মতো দেশে শুধু আইন প্রয়োগ করে মানুষকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখা বাস্তবতার নিরিখে সত্যিই কঠিন। আমরা পদে পদে এর প্রমাণ পাচ্ছি। সামাজিক ও ব্যক্তির সুখ-শান্তি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতি বছরের রোজা মুসলমানদের জন্য আত্মত্যাগ ও সঠিক পথে চলার একটা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। বাস্তবতা হচ্ছে পুরো মাস প্রশিক্ষণ শেষে যা ছিলাম তাই থেকে যাচ্ছি, প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

তেমনিভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাজও ফলদায়ক হচ্ছে না। আজীবন নামাজ পড়ছি, আবার নামাজ থেকে উঠেই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি, সব ধরনের মিথ্যা ও দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছি। আইনের শাসনহীনতা গাঁড়ের উপর বিষফোড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও নামাজের প্রতি রাকাতে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, 'আমরা শুধু আপনারই দাসত্ব করি (আমরা শুধু আপনার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করি) এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে স্থায়ীভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে, যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। তাদের (পথ ব্যতীত) যাদের উপর (আপনার) গজব পড়েছে এবং তাদেরও (পথ) নয় যরা পথভ্রষ্ট (হয়েছে)' (সূরা আল ফাতিহা; ১:৫-৭)। সুস্থ মন নিয়ে বুঝে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ে সেই মতো দুনিয়াদারি করলেই তো জীবনে সব অন্যায়-অবিচার, কপটচারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা অধিকাংশ মুসলমান না বুঝে, নামাজে বলা কথা না-পালন করে

নামাজকে গতানুগতিক ইবাদত তৈরি করে ফেলেছি, যা দুনিয়াদারির কোনো ভালো কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতেও পারছে না। আফসোস!

আমি মুসলমানিত্বকে কোনো সাজসজ্জা, লেবাস ও লৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাইনে। মুসলমানিত্ব সারা জীবনের চিন্তা-চেতনা ও কাজের বৈশিষ্ট্য এবং জীবন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট পথধারা, যা কপটচারিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত করে। আজকের লেখায় বেশি ভনিতা না করে চলতি বাস্তবতা অল্প করে লিখছি। এদেশে কপটাচারী যতই মুখের জোর দেখাক না কেন, মনে মনে সে দুর্বল। সত্যের পথ চিরদিনই শক্তিশালী। তবে এদেশে সত্যের পথে টিকে থাকা অনেক শক্ত কাজ, কখনো পিঠে বস্তা বেঁধে রাখতে হয়, নইলে কপটচারীরা পিঠের চামড়া উঠিয়ে ফেলে। একথা বলছি এ কারণে যে, আমার দেখায় এদেশ থেকে সত্য প্রায় অপসৃত-কোনঠাসা, মিথ্যার জয়জয়কার, মানসিক শান্তির পরিবেশ তলানীতে ঠেকেছে, ধার্মিকতা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় ভরা, চোরের মা-র বড় গলা সর্বত্র, রাজনৈতিক মানসিকতার বিপর্যয় ও সোস্যাল মিডিয়ার লাগামহীন স্বাধীনতাসহ মনুষ্যত্বহীন সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা আমাদের এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গায়কও গেয়ে চলেছেন, 'মুখ দেখে ভুল করো না মুখটা তো নয় মনের আয়না, মানুষের ভিতরের খবর তো কেউ পায় না, সাধু আর শয়তানে রে ভাই দুনিয়ায় চলেছে লড়াই, কে সাধু কে শয়তান কিছুই বলা যায় না, দেখে-শুনে তাই করো না যাচাই...'।

ছোট্ট দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, যা এদেশের বৃহত্তর অপকর্মের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। গত সপ্তাহে ইফতার বাজারে গেলাম ইফতার কিনতে। দোকানের সামনে চরম ভীড়। একজন হঠাৎ বলে উঠলো 'পকেটমার'। মানুষ ধর ধর করে উঠলো। অমনি টুপি মাথায়, পাঞ্জাবি পরা এক লোক ভিড় ঠেলে দৌড়ে পালাতে লাগল। পিছু পিছু তিনজন ধর ধর বলে ধাওয়া করলো। পকেটমার তো পগার-পার। যারা ধর ধর করে পিছু ধাওয়া করলো তারাও আর ফিরে এলো না, তারাও যে পকেটমারের সাঙ্গপাঙ্গ নয়, এটা বুঝবো কীভাবে! আমরা ভালো মানুষের প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কপটচারীর সংখ্যা বেশি বলেই হয়তো এরকম হচ্ছে। এতে প্রকৃত ভালো মানুষ পদে পদে অসম্মানীত হচ্ছে। কপটচারীরাও অবস্থাভেদে পার পেয়ে যাচ্ছে। টুঙ্গির ইজতেমার ময়দানে টুপি-পাঞ্জাবি পরা এ-রকম জোচ্চর তো প্রতিবছরই কিছু ধরা পড়ে পত্রিকার শিরোনাম হয়। একটা দেশে ভালো-খারাপ লোক মিলেই বসবাস করবে এটাই স্বাভাবিক। খারাপ লাগে অন্য জায়গায়। কেউ খারাপ কাজ করলে করুক, কিন্তু ধর্মের নামে ও মুসল্লি সেজে করবে কেন? এরই নাম কি কপটচারিতা? কপটচারিতা মানে ধূর্ত, মিথ্যাচারী, ঠক, ছদ্মবেশী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা। মনের হীন উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে মুখোশ পরে জনসমাজে মানুষ ও নিজের জাগ্রত বিবেককে ঠকানোর জন্য কাছা মেরে নামা। যার গায়ের গন্ধে কাছে ঘেঁষা যায় না, সে আতর আলী বলে নিজেকে দাবি করে। এভাবেই দেশটা চলছে। এ রোগের প্রকোপ এদেশে বেশি, যার ফলে সাধারণ নিরীহ মানুষ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার মনে হয় রোজার মাসে রোজার দোহায় দিয়ে এদের পদচারণা বেড়ে যায়, যেমন অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাত-ব্যথা রোগীদের রোগ বেড়ে যায়; যে-কোনো কোথাও নির্বাচন এলেই সবাই জনদরদি সাজার চেষ্টা করে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলাবাজি করে কিংবা সোস্যাল মিডিয়ায় লিখে ফলাও করে নিজেকে জাহির করে। অথচ আত্মশুদ্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার কোনো নাম-নিশানা নেই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তো সবকিছুই বোঝেন ও মনের খবর জানেন। এটা কিন্তু কপটাচারীরাও বোঝে। হয়তো ভাবে, 'শেষ বয়সে একবার, নইলে দু-বার হজ পর্ব সমাধা করে সব কিছুকেই মাফ করিয়ে শিশুসদৃশ পুণ্যাত্মা হয়ে বিনা বাধায় জান্নাতুল ফেরদাউসে পোঁছে যাবে। যাহোক মনে মনে একটা নিদেন বুঝ ও বুদ্ধি ওদের অবশ্যই আছে। আমরা ক্রমেই লোকদেখানো মুসলমান হয়ে যাচ্ছি না তো!

এ ছাড়াও একটা শ্রেণি এদেশে বিদ্যমান। এরা সবকিছুতে গা বাঁচিয়ে চলে। তারা চুপ থেকে সত্য গোপন করে। ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। অন্যের উপকারে সত্যকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসতে চায় না। এটা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমাদের মুসলমানি স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। মিথ্যাকে জ্ঞাতসারে মেনে নিচ্ছি, আত্ম-প্রবঞ্চনা করছি। সামনাসামনি কথা না বলে গোপনে চুগোলখোরি করছি। দুই বিরোধী পক্ষের কাছেই ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করছি। অধিকাংশের কথা ও কাজের উপর ভরসা করা যায় না। এটা আবার কেমন মুসলমানিত্ব? কোনো মৌলবি-

মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলে কিছু না ভেবেই সোজা উত্তর 'এগুলো কিয়ামতের আলামত'। উত্তরটা দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' কথাটা হয়তো তার জানা নেই, অথবা জানা থাকলেও মুখস্ত আছে, অভাবিত রয়ে গেছে। এসবই আমাদের নিজ হাতে তৈরি সমস্যা। নাস্তিক বাদে সব মুসলমানই কমবেশি পরকালের ভয় করে। যাদের ধর্মীয় বক্তৃতা দেওয়ার দায়িত্ব, তারা কি বিষয়গুলোর গুরুত্ব ও ভুলগুলো বারবার মানুষের সামনে কুরআনের ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরতে পারে না? এতে সমাজ থেকে অনেকটাই কপটচারিতা দূরীভূত হয়। বারবার রমজান আসে, রমজান যায়; প্রশিক্ষণটা অধরাই রয়ে যায়। এটাও আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর অন্য মাসগুলোর তুলনায় ইফতার মহফিলেই বেশি খরচ। অন্য কোনো ভিনজাতি দেখলে 'ফুড ফেস্টিভ্যাল' বলে ধারণা করবে। অথচ নিজে অল্প খেয়ে, অপচয় না করে সম্পদটা গরিব-দুঃখীকে দান করলে একদিকে ইবাদত, অন্য দিকে গরিবের টিকে থাকার সম্বল বাড়ে। এদেশে যে কোনো ভালো কাজ করার জন্য একদল সুস্থ-মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টাই যথেষ্ঠ।

এদেশে যত ধনী আছে, যথাযথ পরিমাণ জাকাত আদায় করে সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে গরিব-অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করলে পাঁচ বছরেই দেশে সাম্যের নীতি বাস্তবায়িত হতে পারে। আমরা ইবাদত করি বটে, টাকা খরচ এড়িয়ে নামাজ-রোজা-তসবিহ তেলাওয়াত বেশি করে পরবর্তী সাত প্রজন্মের জন্য সম্পদ মজুদ করি। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট-জীবের মধ্যে এ প্রবণতা নেই। যেখানে নিজের অধিক ত্যাগের মাধ্যমে ইবাদতের কথা বলা আছে, কুরআনের সে আয়াতগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সুবিধাজনক আয়াতগুলো পালনের চেষ্টা করি। আসলেই এগুলো আল্লাহর সাথে মশকরার সমতুল্য।

আমরা দুনিয়ার কল্যণকর ও ভালো কাজকে ভুলে পরকালের বেহেশত পাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির পুরো উদ্দেশ্যকে বরবাদ করে দিতে চলেছি। একটা আয়াত লিখে শেষ করবো। '(সালাত শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেশতাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে (সালাতের অনুষ্ঠানসমূহ নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে-শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে), যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে; তারাই সত্যবাদী; আর তারাই হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি' (সূরা আল-বাকারাহ; ২: ১৭৭)। আমি আমাদের সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উপরিগত বিদ্যা বিসর্জন দিয়ে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় কুরআনের মর্মবাণী খোলা মনে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করবো। তাহলে সমাজ ও মানুষের মনের অন্ধকার ও কপটচারিতা অনেকটাই দূরীভূত হবে বলে আশাবাদী।

(৫ এপ্রিল ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ